তারিখ 22 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

সমকাল

ঊনসত্তরের ছাত্র-গণআন্দোলনের সাফল্য

ফিরে দেখা | **এসআইএম নূরুন্নবী খান বীরবিক্রম**

প্রকৌশলী, মুক্তিযোদ্ধা, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল; ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকালীন ইউকসু ভিপি এবং কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের শীর্ষস্থানীয় নেতা

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর এক গোলটেবিল বৈঠকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ছয় দফার মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করে ফেলার ষড়যন্ত্র খুঁজে পায়। 'বাঙালির বাঁচার দাবি ছয় দফার' পক্ষে দিন দিনই বাংলার আপামর জনতার সমর্থন বাড়তে থাকে। ৭ জুন ঘোষিত হলো 'ছয় দফা দিবস' হিসেবে। ছয় দফা দাবি উত্থাপনের কারণে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর নেমে আসে অমানবিক নির্যাতন। আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করার লক্ষ্যে অধিকাংশ নেতাকর্মীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

১৯৬৭ সালের ২০ জুন ঢাকা সেনানিবাসে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' নাম দিয়ে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে 'বাংলাদেশ' নামক পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অভিযোগ এনে রাষ্ট্রদ্রোহের বিচারকাজ শুরু হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া মামলার অন্য অভিযুক্তরা ছিলেন সামরিক বাহিনী এবং বেসামরিক প্রশাসনের সদস্য। পাকিস্তানের সামরিক শাসক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান বাঙালির বাঁচার দাবি ছয় দফাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্যই এ মামলাটির মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এবং এনএসএফ (দোলন) নামের এই চারটি ছাত্র সংগঠন নিয়ে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। এই সময় ডাকসু ভিপি ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। প্রণীত হয় ছাত্রসমাজের ১১ দফা কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি 'ছয় দফা' এবং 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহারের দাবিও সংযুক্ত করা হয়েছিল। একটি বৃহত্তর ছাত্র ও গণআন্দোলনের জন্য ছাত্রসমাজ প্রস্তুত হয়ে যায়।

১৯৬৯ সালের ১৭ জানুয়ারি শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে এক ছাত্র সমাবেশ ও মিছিলের মাধ্যমে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঐতিহাসিক ১১ দফা আন্দোলনের সূচনা করা হয়। মিছিলটি ছিল খুবই সীমিত আকারের। পরদিন ছিল ১৮ জানুয়ারি। এদিনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ব্যাপক পুলিশ ও ইপিআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়। তার মধ্যেই ছাত্ররা বটতলা থেকে মিছিল বের করে। পরদিন রোববার হওয়ায় এদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল।

১৯ জানুয়ারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিছিল বের করে। মিছিলটি শহীদ মিনার ও বকশীবাজার হয়ে লালবাগে দৈনিক আজাদ পত্রিকার কার্যালয়ের সামনে গেলে তিন দিক থেকে পুলিশ ও ইপিআর বাহিনী আক্রমণ করে। অনেকে আহত হন। ২০ জানুয়ারি আসাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ ধারণ করে। ২৪ জানুয়ারি সেক্রেটারিয়েট ঘেরাও কর্মসূচিতে ঢাকার নবকুমার স্কুলের ছাত্র মতিউরসহ কয়েকজন আন্দোলনকারী নিহত হলে ১১ দফা আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আপামর জনতা এ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। হরতাল, অবরোধ, মিটিং, মিছিল অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের প্রিজনসেলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হককে গুলি করা হয়।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

চারদিকে তখন থমথমে ভাব। রাত ১টার দিকে আমরা খবর পেলাম যে সার্জেন্ট জহুরুল হকের লাশ তার ছোট ভাই অ্যাডভোকেট আমিনুল হকের (পরবর্তীকালে অ্যাটর্নি জেনারেল) এলিফ্যান্ট রোডের 'চিত্রা বিল্ডিং'-এর বাসার সামনে অ্যাম্বুলেন্সে করে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে রেখে গেছে। অ্যাডভোকেট আমিনুল হকের বাসায় পৌঁছে আমরা সার্জেন্ট জহুরুল হকের লাশ নিয়ে মিছিল করার অনুমতি নিলাম। পলাশী বাজারে এসে সকালের মিছিলের জন্য কয়েকটি ব্যানার তৈরির ব্যবস্থা করলাম। একটি ব্যানারে লেখা ছিল 'স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শহীদ সৈনিক-সার্জেন্ট জহুরুল হকের রক্ত বৃথা যেতে দেব না'। আরও কয়েকটি ব্যানার ছিল, যেগুলোর মধ্যে লেখা ছিল– 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার কর', 'শেখ মুজিবকে মুক্তি দাও', 'তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ', 'সার্জেন্ট জহুরের রক্ত-স্বাধীনতার মন্ত্র'– এসব। সার্জেন্ট জহুরুল হকের লাশসহ উদ্দেশে রওনা হই। মিছিলটি আবদুল গনি রোড হয়ে প্রাদেশিক মন্ত্রী সুলতান আহমেদের বাসার সামনে (বর্তমান শিক্ষা ভবনের পাশের বিল্ডিংটি) এলে ছাত্র-জনতা ওই বাসার দেয়াল টপকে ফুল সংগ্রহের জন্য ঢুকে পড়ে। উল্টো দিকে আরেক প্রাদেশিক মন্ত্রী অংশু প্রু চৌধুরীর বাসায়ও ফুল সংগ্রহের জন্য বেশ কিছু ছাত্র-জনতা ঢুকে পড়ে। মন্ত্রী সুলতানের বাসার দোতলা থেকে ভয়ে তার মেয়ে ফাঁকা গুলি ছুড়লে ছাত্র-জনতা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আমি ওই বাসার দেয়ালে উঠে ছাত্র-জনতাকে শান্ত করি।

মিছিলের একটি অংশ বাংলা একাডেমি এলাকা সংলগ্ন একটি কোয়ার্টারে, যেখানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান বিচারপতি এসএ রহমান অবস্থান করছিলেন, সেখানে হামলা করে। অন্য একটি দল শাহবাগ এলাকায় মন্ত্রী নবাব হাসান আসকারীর বাসায় (বর্তমানে জাতীয় জাদুঘর) হামলা চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। আরেকটি দল পরীবাগে খাজা নাজিমুদ্দিন ও খাজা ওয়াসি উদ্দিনের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মগবাজার এলাকায় মুসলিম লীগের বেশ কিছু নেতার বাসা-বাড়ি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাংচুর ও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পরপর ঢাকা শহরের সর্বত্র অসংখ্য বাড়িঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে থাকে। এদিকে মূল মিছিলটি নিয়ে আমি আজিমপুর নতুন কবরস্থান এলাকায় পৌঁছে যাই। যথারীতি সার্জেন্ট জহুরুল হককে দাফন করা হয়। যে ব্যানারটিতে 'স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শহীদ সৈনিক-সার্জেন্ট জহুরুল হক' লেখা ছিল তা আমি নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ঝুলিয়ে দিই। দাফন কাজ শেষ করে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আমি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ফিরে আসি।

১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. জোহাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈনিকরা বিশ্ববিদ্যালয় গেট এলাকায় গুলি করে হত্যা করে। এ সংবাদ ঢাকায় পৌঁছলে পুরো শহরের মানুষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ১৯ ফেব্রুয়ারি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা মিছিল বের করে শিক্ষক হত্যার প্রতিবাদ জানান। ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে সারা প্রদেশে ব্যাপক প্রস্তুতির নির্দেশ পাঠানো হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি পালনের লক্ষ্যে সমগ্র প্রদেশের সব কয়টি শহীদ মিনারে ছাত্র-জনতার ঢল নামে। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার ছিল না, সেখানে অস্থায়ীভাবে শহীদ মিনার তৈরি করা হয়েছিল। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কলাগাছ দিয়ে শহীদ মিনার তৈরি করা হয়। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শহীদ মিনারে জনতার দাবি আদায়ের বজ্রকঠিন শপথ নেওয়া হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সব অভিযুক্তকে মুক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়। এটি ছিল ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রথম সাফল্য।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবসহ সব রাজবন্দিকে মুক্তির নির্দেশে আমরা তখন আনন্দে আত্মহারা। ২৩ ফেব্রুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শেখ মুজিবুর রহমানকে এক গণসংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হন। ২৩ ফেব্রুয়ারির গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আর এদিন থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পরবর্তী সময়ে তিনি হন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক দিন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় নিশ্চিত ফাঁসির মঞ্চ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলাম। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান না হলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার হতো না এবং ওই মামলার এক নম্বর আসামি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের ফাঁসি ছিল অবধারিত।